স্বয়ংপ্রকাশ বোধস্বরূপা 'অমা' ঈশ্বরীর কথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

''যাঁর রূপের আলোয় জগৎ আলো, তারে কিনা বলে কালো!
কেমন করে দেখবে মা বল্ অন্ধজনে তোর ও আলো?'' —

সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ব্যষ্টিচেতনার আত্মবোধকে একীভূত করে যিনি আপনার পরমাত্মবোধে মিলিয়ে-মিশিয়ে নিয়ে একাকার করে আবার তাকে ব্যক্ত করেন, পরমাত্মার সেই দিব্য ঐশ্বরিক স্বপ্রকাশত্বের অসীম শক্তিভাবকেই বলা হয় 'অমা'। এই 'অমা' হলেন 'চিদাম্বরা'। (অন্ধকারময়) চিৎরূপ অম্বর যাঁহার অর্থাৎ, চিৎস্বরূপের অম্বর বা চিন্ময় আকাশবক্ষে যিনি চিদালোকের প্রকাশে তাঁর স্বভাবরূপের আত্মপ্রকাশ করেন। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন, ''মা আমার তাই দিগ্‌বসন,'' অর্থাৎ, অসীম আকাশ যাঁহার বসন বা আচ্ছাদন, তিনিই হলেন চিদাম্বরা মা ব্রহ্মময়ী। এই 'অম' শব্দ থেকেই আমরা ভগবতীকে বলি অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা। ইনি পরমব্রহ্মস্বরূপের সঙ্গে নিত্যযুক্তা মহাশক্তি বলে স্বপ্রকাশে এঁনার স্বরূপ হয় যোগমায়ারূপী চিন্ময়ী। ওই 'অম' শব্দকেই বিপরীতভাবে সাজালে হয় 'মা' বা 'মায়া'। এই 'অমা' শক্তিরূপী যোগমায়া বাঙ্ময়ী হয়েই বিশ্বমূর্তি ধরেন। আবার এই বিশ্বমূর্তিতেই 'মা' 'মায়া' উপাধি ধারণপূর্বক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকরতঃ বিশ্বপ্রকৃতি সৃজন ও পালন করেন। তাঁর চেতনার প্রকাশরূপ বাক্ প্রকাশের ফলেই অক্ষর ব্রহ্মের উদ্ভব হয়, যার ফলে হয় সৃষ্টিতত্ত্বের উদ্ভব এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব। তাই এই মহাশক্তিই হলেন ব্রহ্মাজননীরূপা এই বিশ্বের জননী জগদ্ধাত্রী আদ্যাপ্রকৃতি।

'অমা'র আদি প্রকাশ বাক্। এই বাক্ হলেন অগ্নিরূপা এবং এই বাক্-অগ্নির নাম জাতবেদ। যিনি সঞ্জাত হন নিজেকে ও নিজের মহিমাকে অবগত হতে হতে, তিনি হলেন জাতবেদ। এই অগ্নি অন্তঃস্থ জ্যোতির শিখা হয়ে আমাদের আত্মসত্তার জন্ম-জন্মান্তরের খবর রাখেন যা আমরা ব্যক্তিসত্তার চেতনায় বিস্মৃত হয়ে যাই। জীবের প্রতিজন্মের মূলে অন্তর্গূঢ় থেকে তার সংক্রমণের সব খবর রাখেন বলে অগ্নিকে বলা হয় 'জাতবেদা'। এই বাক্‌রূপী চিন্ময়ী তেজ হল রুদ্ররূপের প্রকাশ' সাধকগণের বোধাকাশে শব্দব্রহ্মরূপী নাদ পরিস্ফুট হবার পূর্বে যে অগ্নিরূপী তেজ বা দীপ্তি প্রকাশিত হয়, তাই বাক্। সৃষ্টিতত্ত্ব মধ্যে এই বাকের চার অবস্থা আছে; যথা — পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী। পরাবাক্ আনন্দরূপা চিন্ময়ী পরাদেবী। ইহার তেজের স্বরূপ হল পশ্যন্তী বাক্। তেজরূপ বাক্ পরিস্ফুট হলে পরে ভাবতরঙ্গাকারে সত্তার হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রাণপ্রবাহরূপে জাগ্রত হয়। প্রাণকেই উপনিষদে বায়ু বলা হয়েছে। অধিদৈবে যিনি বায়ু, অধ্যাত্মে তিনিই প্রাণ। প্রাণের প্রবহনময়ভাব লক্ষ্য করে কর্ম বা যজ্ঞ বা বায়ু বলা হয়। প্রাণের রসাত্মকভাবের উপাধি হল 'অপ' বা জল। এক্ষেত্রে প্রাণকে মধ্যমা বাক্ বলে। ঋষি অনির্বাণের কথায়, 'ঋত' বিশ্বেরমূলে যে সত্যের ছন্দ সে-ই মহাপ্রকৃতির ছন্দময় বিধান বা মহাপ্রকৃতি স্বয়ং। তাঁর 'যোনি' প্রাণসমুদ্রের গভীরে, সেখান হতেই বিশ্বভুবনে তাঁর বিস্তার। পরমব্যোমে যেমন নিবৃত্তির ইঙ্গিত(পরাবাকে), ঋতযোনিতে তেমনি প্রবৃত্তির ইঙ্গিত (হৃদয়ে)।'' এখান থেকেই ইন্দ্রিয়রূপে প্রজ্বলনশীল মনের ইন্দ্রত্বের উদ্ভব হয়। বোধ বা ভাব শব্দ ও চিন্তনের আকারে সত্তার বক্ষে ফুটে উঠলেই সেই চিন্তনের বিষয়গ্রাহী ইন্দ্রিয় তৎক্ষণাৎ প্রদীপ্ত হয়। রূপময় না হলে যেমন দেখা সম্পূর্ণ হয় না, তেমন বিষয়হীন ইন্দ্রিয় যখন শুধু শক্তির আকারে থাকে তখন তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না। এক্ষেত্রে 'রূপ' ও 'অন্ন' অভেদ; এই রূপময়তার জন্যেই সকল বস্তুকে 'ইদং' ভাবে গ্রহণ করা যায়। যিনি এই 'ইদং' ভাব ফুটিয়ে তোলেন, তিনিই ইন্দ্র পদবাচ্য। আবার অধ্যাত্মে আত্মবোধকেও ইন্দ্রই প্রকাশিত করেন ইন্দ্রিয়ময় করে। এই ইন্দ্ররূপী মনের অনুসরণেই প্রাণ, তেজ ও আত্মবোধ সত্তার বোধের আকাশে স্ফুরিত হয়। তাই উপনিষদের মতে ইন্দ্রই প্রথম ব্রহ্মকে অবগত হতে পেরেছিলেন। শব্দ যখন মনের রূপ ধরে এবং বোধাকাশে সত্তার মনদর্পণে চিন্তার প্রবাহকে রূপায়ণ করে তোলে, তাই হল বৈখরী বাক্। বাহ্য বোধের আকাশ ভগবতীরই বৈখরী বাকের প্রকাশ। আত্মা স্বয়ংই মহাশক্তি পরমেশ্বরী, এই দর্শন ও উপলব্ধি করাই হল পরমাত্মদর্শন। সাধকের সাধন-সমরে স্বয়ংপ্রকাশ এই বোধস্বরূপা 'অমা' মহেশ্বরীর অবদান বিষয়ে দেবী শ্রীশ্রীচণ্ডী স্বরূপের তত্ত্বগত ব্যাখ্যায় মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অপূর্বভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'চিদাম্বরা' গ্রন্থে — যথা —

''স্বয়ংপ্রকাশ বোধস্বরূপ 'অমা' ঈশ্বরী কথা কয়ে বেদময় হয়ে, এই বিশ্বমূর্ত্তিতে সম্ভূতা হয়ে বিরাজ করছেন। বদ্ধ জীব দেখে সে নিজেই কথা বলে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ দেখেন - চেতনই ফুটে ওঠেন, আবির্ভূত হন। নিজেই নিজেকে করে তোলেন কামময়,

কালময়, ভোগময়, প্রাণময়, মনোময়, অর্থময়। এই আবির্ভাব হয় প্রচণ্ড তেজে বিদ্যুৎ যেমন জ্বলে ওঠে তেমনি, তাই এই আবির্ভূতির নাম 'চণ্ডী'। প্রতি বাক্ প্রকাশে অন্য সমস্ত বাক্‌কে সেইক্ষণে দমিত বা অব্যক্ত করা দেখেই 'ধৃতমুদ্‌গর-বৈরিজিহ্বা' বলে ভগবতীকে আমরা সম্বোধন করি। প্রচণ্ডা আবির্ভূতিই তাঁর চণ্ডী নামের পরম সার্থকতা। যে মুহূর্তে তাঁকে ডাকা যায় সে মুহূর্তেও সে-ই বাঙ্ময়ী বিশ্বকে অসুরের মত দলিত করে দমিত করে বিদ্যুতের মত ছুটে আসেন। এই মহাশক্তি বাঙ্ময়ী ও দীপ্তিময়ী মূর্ত্তি রূপেও নিজেকে প্রকাশ করেন; তখন তাঁর নাম 'কন্যা'('কন্' মানে শব্দ, কন্ মানে দীপ্তি)। 'চম' চমকিত হওয়া ও 'ডীয়ন' আকাশে গমন করা বা শব্দময় হওয়া, আকাশ হওয়া এই তাঁর চণ্ডীত্ব। সর্বভূতই আকাশ বা শব্দ থেকে জাত। পরাবাক্ রূপ আত্মা আপনি আপনাকে নাম রূপময় করেন, আপনি আপনার নাম-রূপ সংহরণ করে, তাই তাঁর নাম চামুণ্ডা। এই চণ্ডীতে তিনটি চরিত আছে প্রথম চরিত তেজ, দ্বিতীয় চরিত জল-প্রাণ-কর্ম, তৃতীয় চরিত মন।

প্রথম চরিতে বাক্‌প্রকাশ, শুধু আনন্দেরই শিহরণ তাই সেখানে নন্দা শক্তি। এই চরিতে বীজ যে বিশিষ্টভাবে জাত হয় তা হল চূর্ণ করা, চূর্ণ করে তাতে রাগ রক্ত প্রকাশ করা তাই বীজ এখানে 'রক্তদন্তা'। প্রথম চরিতে জ্ঞাতা হওয়া, প্রাজ্ঞ হওয়া ইহা অস্মিময়, কালময়। প্রথম চরিতের পুরুষ ক্ষরাত্মাময় অক্ষর। এই চরিত অব্যক্ত হিসাবে তামসিক। এই নন্দাই মন্ত্রশক্তি। তিনি নেমে আসেন লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ বর্ণত্রয়কে পান করে, তিন দেবতাকে সমূহিত করে তাই তিনি পীতবর্ণা।

দ্বিতীয় চরিতে ভাবময়, প্রবাহময় বাক্, সকল শক্তির শক্তিত্ব তাই সেখানে শাকম্ভরী শক্তি। এই চরিতে ভোগময়, কর্মময় হওয়া ও ভোগ থেকে শক্তিময় হওয়া তাই বীজ এখানে 'দুর্গা'। দ্বিতীয় চরিতে সেই ক্ষরিত বহু আত্মার একত্বে গ্রন্থন বিধারণ। এই চরিত একের ব্যপ্তিত্বরূপ রাজসিক। শাকম্ভরী অর্থে শক্তি, ভোগময় শক্তি। শাকম্ভরীই প্রাণদ্যুতি, সমস্ত দেবভাব শক্তিভাব তাঁরই বিস্তৃতি, বিশ্বকে তিনিই প্রাণস্পন্দনময় করে রেখেছেন। অন্তরের চিদাকাশ শাকম্ভরীর দ্যুতিতেই দ্যুতিশীল আর বহির্বোধ ঐ চিদাকাশেরই অনন্ত প্রকাশ। উনিই মুখ্য প্রাণরূপে উপনিষদে বর্ণিত। শাকম্ভরী শক্তির মূর্ত প্রকাশরূপে দীপ্তা হয়ে, প্রাণময়ী হয়ে, পীতবর্ণা হয়ে, কাল প্রকাশের নিয়ন্ত্রিণী দুর্গা রূপে নেমে আসেন। জীবের অনন্ত অনুভূতি সংস্কারের আকারে এই দুর্গাতেই আশ্রয় পায় — সেই সংস্কাররাশির অনুসরণে জীবের জন্ম ও মৃত্যু। তিনি দুর্গস্বরূপ হয়ে জীবকে তার কর্মফলের সহিত বুকে ধরে রাখেন। জীবের চিন্তাধারা ভাবভঙ্গি, ব্যবহারের একটি কণাও নষ্ট হতে দেন না। এই দেবীস্বরূপ দুর্গে সকল জীবের অনুভূতির চাঞ্চল্য গাঁথা থাকে। মুক্তির সময় এই দুর্গ ধ্বংস করে দুর্গ-অসুরকে বধ করে ইনি দেন মুক্ত করে। অনুভূতির চঞ্চলতা রূপ দুর্গ-অসুরকে বধ করেন তাই তাঁর নাম দুর্গা। ইনি দশ হাতে, শত হাতে, সহস্রহাতে কর্মফল ভোগ করতে দেন — যতক্ষণ না এই নিয়ন্ত্রিণী শক্তিকে জানা যায়, চাওয়া যায় ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। চাঞ্চল্যের মাঝেও এঁরই স্থির রূপ দেখতে পেলে অর্থাৎ কম্পনময় ধ্রুবাস্থিতি দেখতে পেলে তাঁকে কাম্পিল্যবাসিনী দুর্গা বলে জানলে রুদ্রগ্রন্থির দুর্গ তখন তিনি ভেঙে দেন, দর্শন হয় মুক্তকেশী অমামূর্ত্তি। তখনই লাভ হয় আপ্তকামত্ব। সংস্কার রচনা থেকে, সেই সংস্কার অনুসরণে জন্ম-মরণ ভোগময় জীবধারা ও সিদ্ধি মুক্তি রচনা করার বোধশক্তির, এই মহিমাকেই বলে দুর্গা। এই ধ্রুবাশক্তিই হৈমবতী উমা। ইনি সর্বভূত প্রকাশের পর্বে পর্বে আত্মবোধরূপে লীলাময়ী হয়ে বিচরণ করেন তাই এঁর অন্য নাম পার্বতী।

তৃতীয় চরিতে শব্দময়, ব্যক্ত বাকের পূর্ণ স্ফুট, ভিন্ন ভিন্ন শব্দরূপে ব্যক্ত হওয়া তাই সেখানে ভীমা শক্তি। এই চরিতে সঙ্কল্পময় হওয়া, অচেতনতাকে পরিস্ফুট করে ভোগ্যভাবে পর্যবসিত হওয়া ও জ্ঞান বিভ্রান্ত হওয়া তাই এখানে 'ভ্রামরী' বীজ। তৃতীয় চরিত ব্রহ্মত্ব। তৃতীয় চরিতে ক্ষরণের ভূতমূর্ত্তি একের বিশ্বমূর্ত্তি। এই চরিত প্রকাশ রূপ সাত্ত্বিক।

প্রথম নন্দা শক্তি বা আনন্দ শিহরণ, দ্বিতীয় তাঁর শক্তি আকারে প্রকটিত হয়ে ক্রিয়াপ্রকাশ, তৃতীয় সেই শক্তি থেকে শব্দ বা চিন্তা জগৎ ফুটে ওঠা — এইভাবেই মহাবোধরূপিণী বাঙ্ময়ী চণ্ডিকা আবির্ভূতা হন। এতেই মহেশ্বর, বিষ্ণু বা ব্রহ্মার জাগরণ। নন্দাশক্তি আনন্দশক্তিময়, মহেশ্বর, অক্ষরাত্মা। শাকম্ভরী বা প্রাণ শক্তিময় বিষ্ণু। শব্দ বা মন্ত্র বা ভীমাশক্তিময় ব্রহ্মা। অজ্ঞান জীবের ভিতর এঁদেরই অনুশাসন কেন্দ্রগুলির নাম রুদ্রগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, ব্রহ্মগ্রন্থি। রুদ্রগ্রন্থি কালানুবেদনরূপ কর্মসংস্কারময় গ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি মমত্বাদিময় ভোগ-কর্ম ও অহং অনুবেদন গ্রন্থি। চিন্তাচক্র, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকারময় যে স্থিতিভাব তাই ব্রহ্মগ্রন্থি।

বাক্যকে পরাবাক্ বলে চিনলে, আত্মা বলে জানলে, চেতন বলে দেখলে - বাক্য আর বাক্য থাকে না হয়ে যায় অমোঘ শক্তিস্বরূপ, বজ্রস্বরূপ - তারই নাম মন্ত্র - তারই সাধ্যভাবে আবির্ভূতির নাম চণ্ডীর আবির্ভূতি।''